ব্রুনাই

প্রধানমন্ত্রী এলেন কিন্তু আমাদের কথা ভাবলেন না

ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষকরা দেশ চেনেন না। তাদের উপার্জন যায় যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডায়...

গত ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বিরাট সফরসঙ্গী নিয়ে ঘুরে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তেল সমুদ্র ধনকুবের দেশ ব্রুনাই দারুস সালাম। এ দেশের রাজা সুলতান হাসানাত বলকিয়া বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে উৎফুল্ল ও হাসিখুশিভাবে সুলতানের ফ্যামিলি অর্থাৎ রাজপরিবারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসলেন।

এত খরচ করে কি জন্য এলেন তা নিয়ে আমাদের প্রবাসীদের মাঝে নানা কথা উঠে এল। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এলেন তা যেমন আমাদের আনন্দের তেমনি গৌরবের। পর পর তিন দিন ব্রুনাইর রেডিও টিভিতে দেখানো হলো আমাদের নেত্রীকে। ভাবলাম আমাদের মতো সাধারণ শ্রমিকের এখানে বসবাস কিছুটা হলেও উন্নত হবে। আমরা নেত্রীর সঙ্গে দেখা করবো, দু'চার কথা বলবো!

যখন শুনলাম নেত্রী ব্রুনাইর কর্মজীবী কিছু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসবেন, ব্যাপারটা শুনে বাঙালিদের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ব্রুনাইতে কর্মরত হাতে গোনা ক'জন শিক্ষক, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। এদের অধিকাংশেরই অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে। দ্বৈত নাগরিকত্বপ্রাপ্ত এসব প্রফেশনালরা কখনো বাংলাদেশে তাদের কোনো উপার্জিত অর্থ প্রেরণ করেন না কিংবা কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন না। এখানে যেসব সাধারণ শ্রমিক ও অন্য পেশার লোকজন আছেন বাংলাদেশে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ প্রেরণ করেন। এ দেশে বাংলাদেশী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মতো সাধারণ শ্রমিকের বিন্দুমাত্র উপকারে আসেন না। সাধারণত একজন শ্রমিক মারা গেলে তার লাশ বাংলাদেশে পাঠানো হয় না। একটি লাশ পাঠাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। এ দেশের কোম্পানি লাশ পাঠাতে একটি পয়সাও দেবে না। আমরা সাধারণ শ্রমিকরা চাঁদা তুলে দু'একটি লাশ দেশে পাঠিয়েছি। এতে কোনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে দুটো টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেন না। এ দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে কি লাভ? জানতে পারলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী নতুন করে কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স ও দক্ষ শ্রমিক পাঠাবেন। শুনে আনন্দ পেলাম এ জন্য দক্ষ শ্রমিক পাঠাবেন। দুঃখ পেলাম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে। ম্যাডাম ভুল করবেন। এদের উপার্জিত অর্থে কানাডায়, আমেরিকায় বাড়ি করবে। বাংলাদেশের উপকারে তারা তিল পরিমাণও আসবে না। তাদের ছেলে-মেয়েরা থাকবে বাংলাদেশের বাইরে। আমি দীর্ঘ ১১ বছর ব্রুনাইতে আছি। আমার নিজের দু'টি ঘটনার কথা বলছি। আমার ভীষণ অসুখ হয়। গিয়েছিলাম ব্রুনাইর বড় হাসপাতালে। টোকেন নেয়ার সময়ে বলেছিলাম আমি বাংলাদেশী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবো। গেলাম বাংলাদেশী ডাক্তারের রুমে। তিনি আমার সঙ্গে অনর্গল ইংরেজি আরম্ভ করলেন। আমি জানি ইনি বাঙালি ডাক্তার। যত বার আমি বাংলায় কথা বলছি ততবারই তিনি ইংরেজিতে কথা বলছেন। উপায় না দেখে আমিও কিছু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বললাম। তিনি কিছুতেই পরিচয় দিতে চাইলেন না। আর আমিও প্রাণ খুলে আমার রোগের বিবরণ দিতে পারলাম না। (ডাক্তার সাহেবের নাম এই মুহূর্তে প্রকাশ করলাম না)। পাঠক আমি হয়ত সামান্য কিছু ইংরেজি জানি বলে কথা বলেছি। কিন্তু যারা একেবারেই ইংরেজি জানে না তাদের উপায়? এই প্রবাসে এমন বাঙালি আছে নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে জানে না। অবশ্যি বর্তমানে ব্রুনাইতে বাঙালি একজন মহিলা ডাক্তার এসেছিল, নাম ডা. সায়েরা বানু। তিনি বাংলাদেশী লোকের মাঝে নাম করেছেন। রোগীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলছেন।

আরেক ঘটনা : গিয়েছিলাম আমরা তিন বন্ধুসহ শপিং-এ। হঠাৎ আমাদের সামনে একজন ভদ্রমহিলা সালোয়ার কামিজ পরা। বয়স বড় জোর ৩৭ কি ৩৮। মহিলার সঙ্গে কেউ ছিল না। আমাদের তিন বন্ধুর ভেতর মোটামুটি ছোটখাটো একটি বাজি ধরা হলো। একজন বললো, ভদ্রমহিলা শ্রীলংকার, অন্যজন বললো, ভারতের। আমি জোর গলায় বললাম, বাংলাদেশের। যদিও তখন আমার ব্রুনাইর বাসের বয়স সবেমাত্র এক বছর। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম ইংরেজিতে। উত্তর পেলাম না। পুনরায় বাংলাতে। না হিন্দিতে। কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না ঐ ভদ্রমহিলার মুখ থেকে।

বেশ কিছুদিন পর বিমান বন্দরে গেলাম। দেখলাম এ ভদ্রমহিলা একজন বাংলাদেশী। এবং ব্রুনাইর কৃষি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। এখনও ব্রুনাই আছেন মহিলা। ঐ মহিলার এমন কি অসুবিধা হতো আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার। অথচ ব্রুনাইতে বিভিন্ন দেশের মেয়ে-ছেলেরা আছে। এসব দেশের মানুষের প্রতি মানুষের একটা মাতৃভূমির টান ও মায়া মমতা রয়েছে। যা আমাদের বাংলাদেশীর মধ্যে নেই। আমাদের বাঙালির মধ্যে আছে শুধু অহঙ্কার।

অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ বাংলাদেশী প্রবাস জীবন যাপন করছে। আমাদের সাধারণ শ্রমিকের খবর কোনো সরকার রাখেনি। এভাবে সরকার আসবে-যাবে, কিন্তু আমাদের সমস্যা থেকেই যাবে। গত টার্মে ব্রুনাইতে হাইকমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা। উনি ব্রুনাইতে সাধারণ শ্রমিকের প্রতি কি আচরণ করেছেন তা কারো অজানা নয়। অতীত টেনে লাভ নেই। বর্তমানে ব্রুনাইতে হাই কমিশনারের কিছু চামচা আমলা আছে। একটি পাসপোর্ট রিনিউ বা নতুন বই করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। তাদের গাফিলতির কারণেই দেরি হয়।

ছোট একটি ঘটনা : একজন সাধারণ শ্রমিক গেছে হাই কমিশনারের অফিসে নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী তার পাসপোর্ট আনতে। অফিসের এক চামচা কর্মকর্তা ঐ লোকটিকে বললো, আপনি বিকাল বেলায় আসবেন, আমি ব্যস্ত আছি। শ্রমিকটি বললো, 'স্যার, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। বিকেল বেলা পর্যন্ত থাকতে পারবো না। পরে বাসায় যাওয়ার বাস পাবো না। 'স্যার' রেগে বললেন, আপনাকে হাই কমিশনারের গাড়িতে দিয়ে আসবো। যান, আমার করার কিছু নেই।

পাঠকবৃন্দ শ্রমিকটির বাসা হলো হাই কমিশনারের অফিস হতে প্রায় ১১৫ কি. মি. দূরে। ঐ স্থানের নাম কেবি। বাসের শেষ টাইম বিকেল ৩টা। এ লোকটি ৩টার আগে বাস না ধরতে পারলে রাতে থাকবে কোথায়। এই হলো আমাদের সাধারণ শ্রমিকের অবস্থা। এদেশে হাজিরা হিসেবে বেতন। যেদিন কাজ করবে না, ঐ দিনের হাজিরা খাতায় হাজিরা উঠবে না। একটি পাসপোর্ট করতে কতো দিন হাজিরা বাদ যায় হিসাব করা যায়! হাই কমিশনারের অফিসে এমন কি কাজ যে একটি পাসপোর্ট ইস্যু করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। সরকারি আইন অনুযায়ী একটি পাসপোর্ট করতে কতো ফি দিতে হয় তা আমার জানা নেই। তবে ব্রুনাইতে পাসপোর্ট করতে লাগে ১৯০ বিএস ডলার। শ্রমিকটি দু'দিন হাজিরা বিএস ৫০ ডলার। যাতায়াত অন্যান্য খরচ আরো দশ ডলার। মোট বিএস ২৫০ ডলার খবচ পড়ে যা বাংলাদেশী টাকায় দাঁড়ায় প্রায় ৮০০০ হাজার টাকা।

আমাদের সাধারণ শ্রমিকদের কতো অশান্তি ভোগ করতে হয় প্রবাসের মাটিতে। তাই বলছি, ম্যাডাম সাধারণ শ্রমিকের কথা কিছু বলবেন কি?

মোস্তফা আনোয়ার মুশু
ব্রুনাই দারুস সালাম

দক্ষিণ কোরিয়া

আইন ও নেশা

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে জনগণের উন্নয়নে, তেমনি জন উন্নয়নে সহায়ক

এক অন্ধ এক আঁধার রাতে অচিন পথ দিয়ে হেঁটে চলছে। পথের মাঝেই এক পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার কাছে অন্ধ পথিক জানতে চায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে কিভাবে পৌঁছানো যায়। পথিকটি ছিল বদমেজাজি। তাই রাগান্বিত কণ্ঠে বলে ওঠে, আরে ভাই অন্ধ মানুষ রাত্রি করে অচিন পথে এসেছেন কেন? অন্ধ লোকটি পথিকের কথায় হেসে ওঠে বলে, আরে ভাই অন্ধ যখন বুঝতে পেরেছেন- আর অন্ধের কাছে যে দিন-রাত্রি সমান তা বুঝতে পারেননি।

প্রিয় পাঠক, জীবন স্রোতে ভেসে এসেছি মাতৃভূমি থেকে অনেক দূরে ভিন্ন এক দেশ, ভিন্ন এক জাতির মাঝে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে অনেক কিছুই চোখে পড়ে। এর মধ্যে কিছু খারাপ আবার কিছু শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কোনো ধর্ম না থাকলেও ঐতিহ্যগতভাবে কোরীয়দের একটি প্রবল পটভূমি আছে কনমুসিয়ান মতবাদের। কনমুসিয়ান মতবাদে পিতামাতা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে গুরুজন এবং অধীনস্থদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত। শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে দেশ যেমন উন্নত ঠিক তেমনি চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলোও উন্নত। তবে এসব চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলো নির্ধারিত কিছু নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের বিনোদন দুটি সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন ধারায় চালিত হয়। এবার নেশার কথাই বলা যাক। বয়স্কদের জন্য ধূমপান থেকে শুরু করে মদ্যপানে কোনো বাধানিষেধ নেই। আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মদ তো দূরের কথা, ধূমপান করাও সম্পূর্ণ নিষেধ। কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক লোকের কাছে কোনো দোকানি কোনো নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি করবে না। সেদিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। মার্কেটে যাবার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে কিছু তরুণ-তরুণী এসে ওদের ভাষায় আমায় সালাম জানায় এবং কিছু উন (টাকা) আমার হাতে দিয়ে বলে, আমাদের কিছু সিগারেট কিনে দেবে?

এ কথাটা বলে ওরা সবাই অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। আমার বোঝার আর বাকি থাকলো না। ওরা সবাই স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। দোকানিওদের কাছে সিগারেট বিক্রি করবে না। তাই ওরা এ পন্থা বেছে নিয়েছে। ওদের হাতে ছিল উপহার। হয়তো কোনো অনুষ্ঠানে যাবে, সেখানে আনন্দ করবে। আমি ভাবতে লাগলাম সিগারেট কিনে দেব কি দেব না। ওরা আমাকে এভাবে ধরে বসেছে শেষ পর্যন্ত কিনে দিলাম। আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো আবারও সবাই। ঠিক তখনই আমার মনে হলো আমাদের দেশের কথা- যেখানে শুধু ছাত্র কেন, শিশুদের হাতে সিগারেট থেকে শুরু করে হেরোইন এবং ফেনসিডিল তুলে দিতেও কোনো দোষ নেই। ক্রেতা আর টাকা হলেই হলো। হায়রে দেশ আমার!

আমাদের সবার চোখের সামনে তরুণ সমাজ বিষাক্ত মাদকের ছোবলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে মাদকদ্রব্য খুব সহজেই চলে যাচ্ছে। নেই কোনো নির্দিষ্ট আইন বা বিধিবিধান। আসুন, আমরা যদি একটু দৃষ্টি দেই, একটু সতর্ক হই তবেই হয়তো আমরাও আমাদের তরুণ সমাজকে এ বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচাতে পারি। আমরা জানি না এটা দিন না রাত্রি। কিন্তু চোখ তো মেলতেই হবে একদিন। জনগণের সহায়ক হতে হবে রাষ্ট্রকে। কিন্তু রাষ্ট্র অন্ধ থাকলে কিছু করার নেই।

মোঃ আলমগীর কবীর (AK), দক্ষিণ কোরিয়া

ইটালি

ভবিষ্যৎ, পেনশন ও দেশের আগামীকাল

পেনশন ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয়

আমার দেশের ক্ষমতাসীন বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কেউই সমাজের জন্য বিপ্লব তো দূরের কথা, কোনো নতুন ধরনের কার্যক্রম বা পদক্ষেপের কথাই চিন্তা করে না বা করতে চায় না। আমার মনে হয়েছে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা, দলে প্রজ্ঞাপন ক্রিয়েটিভ লোকের অনুপস্থিতি, 'নিজেদের আখের গোছানো, দেশের যা হবার তাই হবে'- এই চিন্তা, 'গতানুগতিক ধারায় চলন' নীতি অনুসরণ অথবা রাজনৈতিক আদর্শ বিচ্যুত হয়ে দলগুলোর সাধারণ সংগঠনের ন্যায় কর্মকান্ডে (কখনো অপকর্মে) ব্যাপৃত হওয়া ইত্যাদি উল্লিখিত নেতিবাচক বিষয়টির জন্য দায়ী। তা না হলে স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও প্রায় সেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবস্থার মতোই চলছি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয়গুলোর কোনোটাই কি পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েছে? বিগত সরকারগুলোর কেউ কেউ গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টির মাধ্যমে বাসস্থানের ক্ষেত্রে, প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে (যাতে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে জনগণের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে), উপবৃত্তির মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ভিক্ষা আর খয়রাতির সাহায্যের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বা অসহায় মহিলাদের জন্য জন্য নামমাত্র কিছু ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে কিছু একটা করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এসবের কোনোটাই পরিপূর্ণ প্রয়াস নয়। অবশ্য সমাজের সব দিকের পরিবর্তন করা অল্প সময়ে একজনের তথা একটি সরকারের পক্ষে কষ্টকর। অতএব, একবারে যেকোনো একটি দিকের পরিপূর্ণ সংস্কারের প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন অসহায় মহিলাদের জন্য সামান্য ভাতা প্রবর্তন পর্যন্ত গিয়ে থেমে না থেকে প্রজাতন্ত্রের সব নাগরিকের জন্য পেনশন চালু করার কথা চিন্তা করা যেতো। মহা-পরিকল্পনা করে কর্মসূচিটি হাতে নিয়ে তা কয়েক বছরে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা যেতো। যেমন প্রথমে সব কর্মঠ (পূর্ণ কর্মে নিয়োজিত) জনসংখ্যার পরে আংশিক কর্মঠ জনসংখ্যা, এরপর যারা জীবনের কিছুকাল কর্মঠ ছিল বা যারা কোনো কাজই করেনি তাদের কথা বিবেচনা করা যেতো। এভাবে সমাজের একটি দিকের (পেনশনের) অন্তত পূর্ণ সংস্কার হতো। প্রায় সব মানুষই তার কর্মঠ (Active) জীবনে কিছু না কিছু কাজ করে থাকে জীবিকার জন্য। এ কাজ থেকেই তার জন্য পেনশন প্রবর্তন সম্ভব। রাষ্ট্রীয় সামাজিক সহায়তা (সম্ভব হলে) এর সঙ্গে যোগ হতে পারে। এখানে পেনশনের পরিমাণটা বড় কথা নয়, পরিমাণটা নির্ধারিত হবে যার যার পেনশন তহবিলে অবদান (Contribution) অনুযায়ী। এখন বড় কাজ হচ্ছে, রেওয়াজটা চালু করা। সরকারের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া যেতে পারে। যার কাজ হবে সবার জন্য পেনশন চালু করা যায় কি না, চালু করা গেলে তা কিভাবে (এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ থেকে তথ্য নেয়া যেতে পারে) অথবা চালু করা না গেলে তা কেন চালু করা যাবে না ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়া। এভাবেই বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এর ফলাফল দেশ পাবে। কারণ চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভাবেন রিটায়ারমেন্টের পর কি করবে, কিভাবে সংসার চলবে! তাতে তার আজীবনের সততা বিসর্জন দিতে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হলে চাকরি জীবনের অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেলে অসততাও কমবে বা থাকবে না।

Al-Mamun
VIA Montillo-35, 25128 Breseia,
Italy

দক্ষিণ কোরিয়া

এদের শিক্ষা : কাজ ছোট বড় হয় না

আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন

প্রবাস সম্বন্ধে লিখলে লেখার শেষ নেই। তবে আমার ১২ বছর প্রবাস অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাচ্ছি যে, বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সব দিক দিয়ে পার্থক্য। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো মানসিক কালচার। বিশেষ করে আমাদের দেশের মানুষের 'মন ভালো না', 'মন ভালো না' বলতে ভালোবাসে। আমি এ প্রসঙ্গে আরো বোঝাতে চাচ্ছি আমরা একজন অন্যজনের ভালো দেখতে পারি না। আমরা আমাদের নিজেকে ফাঁকি দিয়ে থাকি। কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকি। কাজে ফাঁকি দেয়া মানে ভাগ্যকে ফাঁকি দেয়া। ভাগ্যকে ফাঁকি দেয়া মানে স্বদেশকে ছোট করা। আমার মতে এই হলো আমাদের উন্নত না হওয়ার মূল কারণ। আমার ১২ বছর প্রবাসের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি। আমি ১৯৯২ সালে ১৫ জুন প্রথম সৌদি আরবের উদ্দেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করি। সৌদি আরবে ছিলাম ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারিতে দেশে চলে আসি। আবার ১৯৯৯ সালের ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় আসি। এবার বলছি মানসিক কালচারের কথা। দক্ষিণ কোরিয়া যদিও ধর্মহীন দেশ তারপরও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এদের কালচারের তুলনায় আমরা বাংলাদেশীরা এদের কাছ থেকে ২শ' বছর পিছিয়ে আছি। এদের মনে হিংসা নেই, নেই এদের মাঝে কোনো উপহাস, কাজের প্রতি সম্মান আছে, কাজ যতো ছোট হোক না কেন, কেউ ঘৃণা করবে না। সত্যিই প্রবাস থেকে এই যে এক শিক্ষা পেয়েছি, স্বদেশের মাটিতে তা শত চেষ্টাতেও পেতাম না। আজ প্রবাসে এসে এই যে এক শিক্ষা পেয়েছি আমি তা আমার প্রিয় ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য বলতে চাই। আমরাও আমাদের কালচার পরিবর্তন করি ঘৃণা, নিন্দাকে পরিহাস না করে হাতে হাত রেখে দেশ উন্নতির হাল ধরি। আমি, আপনি পরিবর্তন হতে হতেই একদিন দেশের সবাই পরিবর্তন হবে।

মোঃ আতিকুল ইসলাম (দুলাল)
Dong Sung D/C, 29/1, Nooeub Dong, Osan City, Kyungi-Do, S.Korea.

ইটালি

পাদোভায় বিজয় দিবস

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ৫ জানুয়ারি ইটালির ছোট্ট সুন্দর শহর পাদোভায় উদ্‌যাপন হলো এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং আলোচনা সভা। বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব পাদোভার সভাপতি আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি আবু সাইদ, বিশেষ অতিথি হেলাল পাটোয়ারী, ফরিদ উদ্দিন, রাজু আহমেদ হুদা, সালাম মাস্টার '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বদেশীয় সংস্কৃতির ওপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ইটালীয় সংগঠন Razzismo Stop-এর প্রেসিডেন্ট Fraucesca Zanotta, অন্যতম সদস্য Luca Bertolino ও Centro social-এর Matteo-এর উপস্থিতিতে Razzismo Stop-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন Cloudia Vatteroni। তিনি আমাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ইটালিস্থ সব প্রবাসী বাংলাদেশীর সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দ্বিতীয়ার্ধে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রচুর প্রবাসী বাংলাদেশী দর্শক-স্রোতার উপস্থিতিতে ইটালিস্থ কণ্ঠশিল্পী বিপ্লব, দেলোয়ার, পিনাক্ষী রায়, জামান, অজিত রায় গানে এবং নৃত্যশিল্পী উত্তরা, তন্নী ও রুমির ছন্দবদ্ধ নৃত্যে এক আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবলায় ছিলেন পলাশ ধর। হাকিম সিকদার, নূরুল আমিন, রফিকুল ইসলাম ও মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায়, হাবিবুর রহমানের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মোর্শেদ ও জুয়েল। অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন মোঃ লিটন মুন্সী।

ইকবাল হোসেন মুকুল
পাদোভা, ইটালি থেকে

সৌদি আরব

রিয়াদ থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ, মক্কা, জেদ্দা, দাম্মামসহ দেশটির প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই বাংলাদেশী অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকসহ বেশ কিছু পত্রিকাই নিয়মিত পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ও বিক্রি হচ্ছে রিয়াদে।

রিয়াদে বাংলা পত্রিকা বিক্রির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে বাংলাদেশী এলাকা রিয়াদের আল-বাথায়। বাথা এলাকাটি আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন বাংলাদেশী মার্কেট, কেরেলা মার্কেট, ফিলিপিনো মার্কেট, সুদানী মার্কেটসহ বিভিন্ন দেশের নামে এখানে মার্কেট গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত মার্কেটগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশী মার্কেটে প্রতি শুক্রবারে যেন বাঙালি প্রবাসীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এখানে শুক্রবারে তিল পড়ার মতো জায়গা থাকে না প্রবাসীদের জন্য। মনে হয় বাংলাদেশেই অবস্থান করছি। প্রতি দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা, বাংলা ভাষায় কথা বলছে প্রতিটি লোক। রিয়াদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি প্রবাসীরা প্রতি শুক্রবারে এই বাথা মার্কেটে জড় হয়। এতে করে সবার সঙ্গে সবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। একে অপরের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলে মধ্যরাত পর্যন্ত কাটিয়ে আবার নিজ নিজ বাসভবনে চলে যায়।

এদের মধ্যে যারা পত্রিকাপ্রেমী তারা দু'একটি পত্রিকা কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রিয়াদে এমন পাঠকও আছে যারা নিয়মিত পত্রিকা কিনতে বাথায় যায়। বাথার প্রতিটি সুপার মার্কেটেই বাংলা পত্রিকা পাওয়া যায়। তবে প্রবাসে আমরা দেশীয় দৈনিকগুলোর এক সপ্তাহের ৭টি সংখ্যার মধ্যে মাত্র দুটি সংখ্যাই পাই প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবারের। এই দু'দিনের পত্রিকা পড়েই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এতে করে কিছু ধারাবাহিক লেখা-পড়া থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়তে গেলে অনেক সময় দেখা যায় দু'একটি দৈনিক ছাড়া প্রায় দৈনিকই ঐদিনের আপডেট করা নেই। তাই বাধ্য হয়ে এক দুইটি পত্রিকা পড়েই থেমে থাকতে হয়। সাপ্তাহিকের মধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০, খবরের কাগজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা পাওয়া যায়।

এই প্রবাসে বাঙালি প্রবাসীরা শত বাধা বিপত্তিকে সামনে রেখে বাংলা ভাষার বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে যাচ্ছে। এতে করে এখানকার লেখক-কবিদের সাহিত্য চর্চা হচ্ছে নিয়মিত। সৌদি আরব থেকে যে সমস্ত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : দেওয়ান আব্দুল বাসেত সম্পাদিত মরুপলাশ, অহিদুল ইসলাম সম্পাদিত অনিবাস, হুমায়ুন কবির সম্পাদিত রূপসী চাঁদপুর, ডা. আরিফ রহমান সম্পাদিত পিলজুস, শাহজাহান চঞ্চল সম্পাদিত রাইটাস, মাহমুদুল সৈয়দ সম্পাদিত আমর্শন, রুমী সাইদ সম্পাদিত উত্তরণ, কাজী নওফেল সম্পাদিত ত্রিকালসহ আরো অনেক লিটল ম্যাগ।

এছাড়া সৌদি আরবের সরকারি মুখপাত্র ইংরেজি দৈনিক দ্য রিয়াদ ডেইলি'র সঙ্গে সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলা বিনোদন নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। যা একটি বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়- কারণ পৃথিবীর সৌদি আরবই একমাত্র রাষ্ট্র যে, প্রবাসী বাঙালিদের কথা চিন্তা করে সরকারি খরচে ঝকঝকে অফসেট পেপারে কালার একটি পত্রিকা উপহার দিয়ে যাচ্ছে। আর যিনি এ পত্রিকাটিকে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় প্রবাসীদের মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছেন তিনি হলেন রিয়াদ ডেইলি'র স্টাফ রিপোর্টার ও বাংলা বিনোদনের সম্পাদক অহিদুল ইসলাম।

এই প্রবাসে শত ব্যস্ততার পরেও এখানকার কৃতী লেখকগণ নিয়মিত নিজ মাতৃকার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য চর্চা করছেন এবং ঢাকার পত্রিকায় ও রিয়াদের লিটল ম্যাগে নিয়মিত লিখছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন কলামিস্ট ও লেখক ড. একে আব্দুল মোমেন, কলামিস্ট ও লেখক মেজবাহউদ্দিন জওহের, ড. আরিফ রহমান, সাংবাদিক ও কলামিস্ট অহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক (চ্যানেল আই) ফখরুল বাসার মাসুম, লেখক শাহজাহান চঞ্চল, মাহমুদুল হক সৈয়দ, কাঞ্চন মল্লিক, লেখক ও ছড়াকার দেওয়ান আব্দুল বাসেত, লেখক ও প্রবন্ধকার রিংকু সারথী, কবি ও লেখক হুমায়ুন কবির, ফিরোজ খান, জাহেদ ফরিদ, জুলি রহমান, মিলি বাসার, ইলা মজিদ, সাংবাদিক আবুল বশির, ফারুক আহম্মেদ চান, সোহরাব হোসেন লিটন, লেখক এম জামালউদ্দিন, আনোয়াদ মাহমুদ, ফজিলত আলম জুঁই, রূপালী দে, ইদ্রিস আলী মেহেদী, করীম রেজা, হাবিবুর রহমান, প্রকৌশলী টি এ এম নূরুল বাসার, আবুল বাসার বুলবুল, আমিনুর রহমান, দলিলুর রহমান, জিয়া মুহঃ শফি নেওয়াজসহ আরো অনেক লেখক-লেখিকা রয়েছে এ প্রবাসে যাদের নাম হয়তো আমার জানা নেই। তারপরও স্বাগতম সবাইকে, যারা এ প্রবাসে শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে সাধারণ মানুষের কথা বলে প্রবাসের নানান দিক তুলে ধরেন নিজের মতো করে লেখনীর মাধ্যমে।

মোঃ বিল্লাল হোসেন, পিওবক্স-৫৮১১৩, রিয়াদ-১১৫৯৪, কে,এস,এ
E-mail: nbbillal@hotmail.com